মেক ওয়াটার ইন টু ওয়াইন

- সালেহা চৌধুরী

ফোনটা কয়েকবার বাজতেই নাসির ফোন ধরে। তারপর ফোনের মুখ চেপে আমাকে বলে-কাইয়ুম, ফোন ধরবে নাকি?

বললাম কে বলো তো? আমি যে এখানে সেটা জানল কী করে। কাইয়ুম বলে-ও বলছে নাম ঋতু। বলছে, নাম বললেই চিনবে।

আমি উঠে এসে ফোন ধরি। হ্যালো, কেমন আছো?

আলো ভাই। খিলখিল হাসি বিনা কারণে। বলে-বলব না কেমন করে জানলাম আপনি এখন পোরট্রিতে। কিন্তু আমাদের বাড়িতে না এসে আপনি চলে যাবেন তাই কি হয়!

অবশ্যই হয় না। বাড়ির ঠিকানা বলো ঋতু। কলমদানি থেকে একটি কলম তুলে নিয়ে লিখি হান্টলি লজ, সিলভার পাইন রোড, নর্থ পোরট্রি। বলি-কত দিন হলো ওখানে বাস করছো?

প্রায় পাঁচ বছর। বলে ঋতু। আবার হাসে। তানিয়া ভালো আছে?

ভালো। চার-চারটে মেয়ে নিয়ে চমৎকারভাবে ভালো। তোমার?

একটি। বলে আবার-কত দিন পর দেখব বলুন তো?

অনেক দিন পর।

অবাক লাগছে, এক ডাকে চিনলেন কী করে!

সত্যি তো ঋতু, চিনলাম কী করে?

মনে আছে আলোভাই আমরা আপনাকে বলতাম ইচ্ছাপূরণ ভাই?

এবার আমি হাসি। বলি-মনে আছে।

একবার ইচ্ছা হলো আমাদের কক্সবাজার যাব, আপনি এক বিরাট মাইক্রোবাস সংগ্রহ করে আমাদের নিয়ে চলে গেলেন সেখানে। একবার মাঝরাতে ইসলামপুরের প্রাণহরা। বলেই আবার হেসে ওঠে ঋতু।

তোমাকে মনে আছে তোমার ওই বিনা কারণে হাসির জন্য। আচ্ছা ঋতু, তোমার মাথায় কি এখনো মেঘের মতো চুল আছে। তানিয়ার আর কোনো বন্ধু আর আমার আর কোনো চেনা মেয়ের অমন মেঘের মতো চুল দেখিনি। আবার হাসে ঋতু। আমার চুল? আসুন নিজের চোখে দেখবেন।

ইচ্ছাপূরণ ভাই তো তোমার ফোনের এপারে। কী চাই তোমার?

ফোনের ওপারে খানিক নিস্তব্ধতা। তারপর আবার সেই হাসি। বলে-মেক ওয়াটার ইনটু ওয়াইন।

লুক ঋতু, আমি জেসাস ক্রাইস্ট-ট্রাইস্ট কিছু নই।

কিন্তু... থাক। বলে আবার হাসে ও।

মানে অলৌকিক কিছু? আমি প্রশ্ন করি ওকে।

সর্ট অফ। ঋতুর কথার সুর-ভঙ্গিমা খানিক বদলেছে। তবু গলার সেই হাসকি ভাবটি আগের মতো। বললাম-রোববার তিন ঘটিকায়। আমি ও আমার বন্ধু যাব।

ভাবি আসেননি?

না।

ছেলেমেয়েরা?

না।

দেখা হচ্ছে রোববার তিনটায়।

দেখা হচ্ছে।

কাইয়ুম বলে-কে ইনি।

আমি একটু অন্যমনস্ক হয়ে বলি-ছোটো বোন তানিয়ার সহপাঠিনী ঋতু।

নাসির বলে-তুমি এসেছো অজ্ঞাতবাসে। একটি বিশাল উপন্যাস গুহালোকে বসে দু সপ্তাহে শেষ করবে বলে। ও কী করে খবর পেল? আর পোরট্রিতে তেমন বাঙালি নেই। সাত বছর বাস করেও ঋতু বলে কাউকে জানি না।

জানো হয়তো মিসেস মহিউদ্দিন-টুদ্দিন কোনো নামে। বিবাহিত মহিলারা যেভাবে পরিচিত হন। নাসির বলে-না ওমন কোনো নামেও কাউকে চিনি না।

আমার উপন্যাসের আর কয়েক পাতা বাকি। শেষ হয়ে যাবে। ও নিয়ে ভেব না।

কথা দেওয়া হয়ে গেছে, অনেকগুলো টাকা আগাম পেয়েছি, এখন বই শেষ করতে হবে। আমেরিকা থেকে ফেরার পথে নাসিরের বাড়িতে চলে এলাম এ কারণে। দ্রুত ঘাড় গুঁজে লিখে বইটি শেষ করে ফেলে দেশে ফিরব। দেশে গেলে কাজ দ্রুত হওয়া মুশকিল। ভীষণ ইচ্ছে আছে ছয় মাস ছুটি নেব বিশ্বসংসার থেকে, তারপর একটি বই লিখব। যে বই গোঁগার শেষ জীবনের সৃষ্টিরহস্যের বিশাল ছবির মতো আমার সৃষ্টিক্ষমতার সবচেয়ে বড় নিদর্শন হবে। জানি না সেটি আদৌ সম্ভব হবে কি না। তবু এই দু সপ্তাহে আমি বেশ বড় একটি কাজ করে ফেললাম এমন ভাবনায় আনন্দিত। একটু বরফে মেশানো স্কচ সিপ করছি নাসিরের সঙ্গে। তখনই এল ঋতুর ফোন। বোনের অনেক বান্ধবীর ভেতর ঋতুকে মনে রাখার কারণ তেমন কিছু নেই। কেবল আমার লেখার এক চমৎকার পাঠিকা আর বিনা কারণে হাসি-এ ছাড়া তেমন আর কী কারণ থাকতে পারে ভাবছি। মনে করতে পারছি না। শ্যামল না ঋতু? হ্যাঁ আর সারা পিঠ ছাপানো চুল। মনে পড়ছে। কত বছর পর দেখব? পনেরো, ষোলো? এমনি কিছু।

সিলভার বার্চের পথ পাহাড় কেটে। গাড়িটা একপাশে রেখে খানিকটা হাঁটতে হয়। নাসির বলে-এদিকে আগে কখনো আসিনি। জায়গাটি পোরট্রি ছাড়িয়ে বিশ মাইল উত্তরে।

একটি এগারো-বারো বছরের ছেলের হাত ধরে দাঁড়িয়ে ছিল ঋতু। বাড়ির সামনে ঘাস আর কিছু অযত্নের গোলাপ-টৌলাপ, বড় বড় টাইগার লিলি, জেরিনিয়ামের মধ্যে। প্রথমে চোখে পড়ল ছোট চুল। অনেকটা ববকাটের মতো। আর ছেলেটি তেমন যে দারুণ এক সুস্থ-সবল তেমন ভাবাও মুশকিল হলো। ওদের পেছনে যে মানুষটি, সে নিশ্চয়ই ঋতুর ঋতুবদলের মাইলস্টোন। বেশ এক ঝকঝকে উজ্জ্বল মানুষ। আমাকে দেখে তিনজন হেসে ওঠে। ঋতুর ছোট চুল বাতাস উড়ছে। এগিয়ে এসে আমার

হাত ধরে। বলে-ইস, সেই কত দিন পর দেখা হলো! মাইলস্টোন সামনে এসে দাঁড়ালে ঋতু হেসে বলে-এ বাবুয়া। আর ও বাবুয়ার বাবা। এই বলে ছেলেকে দেখিয়ে দেয়।

কী নাম তোমার বাবা সোনা?

আমার নাম বাবুয়া। ভালো নাম সাব্বির মহিউদ্দিন।

বাহ, বেশ নাম! বলি আমি।

সাব্বির আমার বাবার নাম আর মহিউদ্দিন আমি। এই বলে কাছে এসে হাত বাড়িয়ে বলে-আমি মহিউদ্দিন আশরাফ। বন্ধুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। তারপর ধীরে ধীরে আর একটু চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে উঠে আসি একটি পুরনো বাড়িতে। বাড়ির নামটি এখনো পড়া যায়। কিন্তু মনে হয় বাড়িটার কলি ফেরানো হয়নি কতকাল। সামনের প্যাবল ড্যাশের ভেতর দিয়ে ফাটল চোখে পড়ে। আর প্যাবল ড্যাশ বাদে যেটুকু অংশ, তা একেবারে ছালওঠা বর্ণহীন। আমি ওপরে উঠি। তারপর একটি ছোট লিভিং রুমে ঢুকে পড়ি। সাদামাটা সোফা আর কয়েকটি ছড়ানো চেয়ার। দেয়ালের কাগজ অনুজ্জ্বল। কেবল ভালো বাড়ির চারপাশ। বার্চ কনিফারের মাঝখানে একটি বাড়ি। চারপাশে মাতাল করা হাওয়া। ঋতুর দিকে তাকিয়ে প্রথমেই যে প্রশ্ন মনে জেগেছিল তা এই-মেঘবতী কন্যা চুলগুলো কাঁচিছাঁটা করলে কেন? বলতে গিয়ে থেমে যাই। আমি যা ভাবছি তা ভাবাতে নিজেকে রাজি করাতে পারি না। প্রায় চারটা বাজে। বন্ধু বলেন-বেশিক্ষণ বসতে পারা যাবে না। ঋতু অবাক হয়ে বলে-তার মানে?

আমাদের আর এক জায়গায় যেতে হবে।

হতেই পারে না।

মহিউদ্দিন সাহেব বলেন-সারা দুপুর রাঁধল। এখন যাবেন মানে!

ঋতু এমন তো কথা ছিল না। আমরা চারটার দিকে আসব তোমাদের দেখে চলে যাব।

তা থাক। আপনি না খেয়ে যেতে পারবেন না।

ঋতুর পায়ের কাছে চুপচাপ বসে আছে ছেলেটি। আপন মনে লোগো নিয়ে কী যেন বানানোর চেষ্টা করছে। ছেলেটির দিকে তাকিয়ে মনে হলো রক্তশূন্যতায় ভুগছে। আমি ওর চুল ধরে একটু নাড়া দিই। বাবুয়া আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসে। তারপর আবার লোগোর ঘরবাড়ি বানানোয় ফিরে যায়। আমি ঋতুকে দেখি। খুব বদলায়নি বটে, তবে কোথায় পরিবর্তন ধরতে পারি না। ভেতর বাড়ি থেকে প্যানকেক আর চা নিয়ে এসেছেন মহিউদ্দিন সাহেব। বললাম-এই তো বেশ। পাটিসাপটা পিঠা আর চা। এরপর আবার রাতের খাবার কেন। ঋতু বলে-আপনি কিছুতেই এখন যেতে পারবেন না। রাতের খাবারে আপনাকে আরো কিছুক্ষণ ধরে রাখার অজুহাত।

এই বলে ঋতু মেঝেতে হাঁটুমুড়ে বসে চায়ে চিনি মেশায়।

নাসির বলে-তুমি যদি থাকতে চাও থাকো। আমি রাত নটার দিকে এসে তোমাকে নিয়ে যাব। ঋতুর ব্যাপারটি পছন্দ হয়েছে মনে হলো। বলল-সেটা মন্দ ব্যাপার হবে না। কিন্তু নাসির ভাই আপনি থাকলেও আমি খুশি হতাম।

পারলে থাকতাম ঋতু।

চা আর নারকেল পুর ভরা প্যানকেক শেষ হয়। কয়েকটি নতুন ছবির বই পেয়ে বাবুয়া বেশ খুশি হয়েছে বুঝতে পারি। নানা গল্প জমে ওঠে নাসির চলে গেলে। সেই সব পুরনো গল্প, যা ঋতু বলে আর হাসে। আমিও হাসি। মহিউদ্দিন সাহেব ভেতরে যান। ট্রে হাতে। আমি বলি-খুব লক্ষ্মী ছেলে তো মহিউদ্দিন সাহেব।

ঋতু হাসে। বলে-আপনাদের দোয়া।

বললাম-কী ব্যাপার ঋতু, এই জায়গায় এত দিন তোমরা আছো, আমার বন্ধু নাসির তোমাদের চেনে না?

আসলে আমরা খুব একটা বাইরে যাই না। মানে যাওয়া হয় না।

কী করেন মহিউদ্দিন সাহেব?

ঋতুর মুখের দিকে তাকাতেই মনে হয় ওর বাঁ চোখটির রঙ ডান চোখের মতো নয়। তারপর মুখ নামায়। বলে-একটি কেমিস্টে কাজ করে। ছয় দিন।

আমার একটু অবাক লাগে এমন কথায়। কারণ ওর যখন বিয়ে হয় তানিয়া বেশ গল্প করে বলেছিল অঙ্কে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম এক গুণী মানুষের সঙ্গে আমার বন্ধু ঋতুর বিয়ে হয়েছে বলে। তারপর বিদেশে এসেও মহিউদ্দিন সাহেব পোস্টগ্র্যাজুয়েট করছেন-এ পর্যন্ত জানা ছিল আমার। আমি বলি-জায়গাটি বুঝি তোমাদের খুব পছন্দ? ঋতু গুছিয়ে বসে। বাবুয়া আপনমনে বই দেখছে। মহিউদ্দিন সাহেব ভেতরবাড়িতে। বলে একবার বেড়াতে এসেছিলাম ওর স্কুলের ছুটিতে। ভালো লেগেছিল এই জায়গাটিকে।

স্কুলের ছুটি? মানে মহিউদ্দিন সাহেব স্কুলে কাজ করতেন?

ঋতু মাথা নাড়ে। আমি চুপ করে থাকি। ঋতুই বলবে তারপর কী হলো। পেটে কথা রাখতে পারে না বলে তানিয়া অনেক অনুযোগ করত, মনে আছে। বলে সে-ব্যাপারটা অনেকটা রেসিয়াল। ইনাডানট্রিয়াল ট্রাইব্যুনালে স্কুলমাস্টারি চিরদিনের জন্য বন্ধ। একবার রেগে টেগে...। ঋতু থামে। মহিউদ্দিন সাহেব ঘরে এসেছেন। বলেন-চমৎকার দিন। পেছনের বাগানে গিয়ে বসো না তোমরা। তারপর ছেলের দিকে তাকিয়ে বলে-বাবুয়া ওষুধ খেতে হবে না?

আমরা বাইরে গিয়ে বসি। আর তক্ষুনি মনে হয় এই বিশাল পেছনের বাগানের কারণে ঋতুরা এখানে বাস করছে। চমৎকার বড় বড় গাছ। যেখানে চতুর কাঠবেড়ালির লেজ উঁচিয়ে আসা-যাওয়া। বাগানের চেয়ারে এসে বসেছে বাবুয়া। মনে হচ্ছে কী সব ওষুধ খেয়ে এসেছে। বাগানের টেবিলের ওপর পড়ে থাকা টিসুপেপার দিয়ে বাবুয়ার মুখ মুছিয়ে দেয় ঋতু। বলে-বেশ না বাগানটা?

চমৎকার। বুঝতে পারছি কেন তোমরা সব লন্ডন ফেলে এখানে আছো।

তানিয়ার মেয়েদের গল্প আর আমার মেয়েদের গল্প হলো। কিন্তু লন্ডনের স্কুলশিক্ষকতা ছেড়ে একটি কেমিস্টে কেন কাজ করছে মহিউদ্দিন সে নিয়ে আর গল্প এগোল না। বুঝলাম কোনো এক ঝামেলায় স্কুলের চাকরিটা নেই। ঋতুর চুলে শেষ বিকেলের আলো। ঝকঝকে আকাশের নিচে বসতে গিয়ে মনে হলো এমন উজ্জ্বল আকাশের তলায় এসে বসতে গেলে আর কোনো কিছু গোপন থাকে না। আর তাতেই খুব ভালো করে বোঝা গেল ঋতুর বাঁ চোখটি একটু নিষ্প্রভ। আর ওর চুলগুলো বোধকরি ওর নয়। এটা ঋতু ফ্যাশন করতে করেছে কি না এমন প্রশ্ন করতে সাহস হয় না। ছেলেটি খেলতে খেলতে ক্লান্ত হয়ে মার কোলে বসে। সযতনে সেই ছেলের মাথায়-মুখে স্পর্শ রেখে ঋতু বলে-এবারে ঘরে যাও। আব্বু তোমাকে ডিনার খাইয়ে দেবেন। মহিউদ্দিন কয়েকবার দেখা দিলেও তিনি মোটামুটি ঘরের ভেতর। বোধকরি কোনো কাজে ব্যস্ত না হলে রান্নায়। না হলে হয়তো আমাদের গল্পের ভেতর এসে বসতে না চেয়ে আমাদের কথা বলার সুযোগ দিচ্ছেন। কোনটা যে ঠিক বুঝতে পারি না। ঋতু বলে-আপনার সব বই আমার আছে। লন্ডন থেকে আনিয়ে নিই।

বলো কী!

বাঃ, এতে অবাক হওয়ার কী আছে? কত রাত জেগে আমি আর তানিয়া আপনার গল্প, উপন্যাসের অংশবিশেষ শুনেছি। আমি জানতাম একদিন আপনার জগৎ জোড়া খ্যাতি হবে। তবে একটা কথা বলব?

বলো। কিন্তু খারাপ কিছু বোলো না। কারণ তুমি জানো আমি আজেবাজে সমালোচনা একেবারে সহ্য করতে পারি না।

জানি। তবু বলব। এরপর একটু থেমে বলে-আমার মনে হয় ইয়োর বেস্ট হ্যাজ নট কামআউট ইয়েট। আমি চুপ করে থাকি। তারপরও আবার বলে-কখনো মনে হয় এই পৃথিবীর সত্যিকারের দুঃখ-বেদনার সঙ্গে এখনো আপনার পরিচয় হয়নি।

তোমার ভুল ধারণা।

তা হবে। কিন্তু আমার মনে হয় ছয় মাসের জন্য কোথাও গিয়ে একেবারে নিজের গভীরে ডুব দিয়ে একটি অভূতপূর্ব কিছু করুন। ইয়োর বেস্ট। যেমন করে পানকৌড়ি নিখুঁত মাছটি গভীর নদী থেকে তুলে আনে। আমার আর ঋতুর ভাবনার মিল এই প্রথম নয়। একটু অবাক হয়ে ওকে দেখি তবু। সবকিছু থেকে ছুটি নিয়ে কিছু করা? এমন ভাবনা নতুন নয়। কিন্তু অনেককেই জানি শেষ পর্যন্ত কোলাহলে ফিরে এসেই জীবন এঁকেছেন। পর্বতের চুড়োয় বা অরণ্যে নয়। অরণ্যসভ্যতার যুগ কবেই তো শেষ হয়ে গেছে।

পরিবেশ হালকা করতে বলি-তোমার বাড়ির ওপরতলার একটি ঘর মন্দ হবে না।

আপনাকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি। দেখেছেন পেছনের গাছপালা?

সে জন্যই তো বলছি।

খুশির আলোয় সারা মুখ উজ্জ্বল করে বলে-সে সৌভাগ্য কি আমার হবে?

ঘর থেকে বাদাম হাতে ফিরে এসেছে বাবুয়া। একটি চেনা কাঠবেড়ালি ওর হাত থেকে বাদাম নিয়ে দে ছুট। একটি চিপমাংক বেড়ার কাছে এসে আবার পালিয়ে যায়। আরো শুনি এই বনে কিছু খরগোশ বাস করে। পাখিদের পানি খাওয়ার পাত্র থেকে পানি খেয়ে উড়ে গেল কিছু পাখি বাগানের আকাশে। নানা রঙ, নানা রূপ। আর দূরে কিচকিচ করছে কিছু পাখি গাছের শব্দের মধ্যে। গাছের ভেতরে বাতাসের আসা-যাওয়ায় কেমন এক ধ্রুপদ সুর উঠছে। কাঠবেড়ালির পানে চেয়ে হেসে ওঠে বাবুয়া। বলে-আম্মু থাম্পার।

ওর সব চেনা কাঠবেড়ালি খরগোশের নাম দিয়েছে ও। তারপর ছেলের কাছে গিয়ে বলে ঋতু-

এবারে আব্বুকে বললেই তোমাকে ঘুমের কাপড় পরিয়ে দেবেন।

মহিউদ্দিন এসে বলে-বাবুয়া চলে এসো। ওষুধ খাবে। তারপর ঘুম।

বাবুয়া অনিচ্ছা সত্ত্বেও চলে গেলে বলি-কী ব্যাপার ঋতু, এত সব ওষুধ-টষুধ-কী ব্যাপার? ঋতু তাকাতেই ওর ঘোলাটে বাঁ চোখ চোখে পড়ে। বলে মুখ নামিয়ে-জন্ম থেকেই হার্টের গোলমাল নিয়ে জন্মেছে। ভাল্ব বন্ধ। ফুটো। একটি বড় শিরা ঠিকমতো রক্ত সরবরাহ করে না। আরো কী সব গোলমাল। চব্বিশ ঘণ্টা চোখে চোখে রাখতে হয়।

কী বলছো?

ঋতু মাথা নাড়ে।

ঠিক হবে না?

এখনো কিছু বলা যাচ্ছে না। হয়তো... কিংবা-এই বলে ঋতু মাথা নামায়। আমরা এরপর অনেকক্ষণ নিঃশব্দ থাকি। একটাই ছেলে তোমার? বলি একটু পরে।

একটাই। ঋতু এমন করে বলল যেন দুটোর কোনো সম্ভাবনা নেই। আমি এ নিয়ে আর প্রশ্ন করি না। তারপর আবার এ-গল্প সে-গল্প। হঠাৎ একটু বড় বড় ফোঁটা বিষ্টি পড়তে শুরু করে। আমরা উঠি। ঋতু বলে-টিপিক্যাল। এই রোদ আর এই বৃষ্টি। মহিউদ্দিন ঝটপট চেয়ারগুলোকে গার্ডেনের শেডে রাখে। রান্নাঘরের ভেতর দিয়ে লিভিংরুমে আসতে হয়। দেখলাম একটি বাকেটে ছাদ থেকে দু-এক ফোঁটা বৃষ্টি এসে পড়েছে। বুঝতে পালাম ছাদ সারাতে হবে। ঋতু বলে-ভেতরে চলুন। হলুদ বাকেটের পাশ কাটিয়ে এবারে ভেতরে আসি। ওপরতলা থেকে নিচে নেমে এসেছে মহিউদ্দিন। বাবুয়াকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে। একটু গল্প করে। খাবার দেওয়ার আয়োজন শুরু হলো। ঋতুও রান্নাঘরে যায়। কোণের গোল টেবিলটি বড় করে সেখানে নানা প্রকার খাবার এনে সাজাতে থাকে ওরা দুজন। আমি বলি-সাহায্য লাগবে?

আপনি চুপ করে বসুন।

আমি ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাতে থাকি। ওল্টাতে ওল্টাতে একটি মেডিকেল রচনায় চোখ পড়ে। ওভারির ক্যানসার। যেখানে কে যেন বড় বড় লাল কালিতে দাগ দিয়ে রেখেছে। দাগ দেওয়ার লেখার শুরু এমন প্রাথমিক অবস্থায় ওভারি বাদ দেওয়ার পর কিছু দিন...ঃ পড়া শেষ হয় না। হৈচৈ করে উঠে আসে ঋতু। বলে-চলে আসুন। টেবিল রেডি। হাত থেকে ম্যাগাজিন নিয়ে দূরের ম্যাগাজিন বাস্কেটে রেখে দেয়। আমার নাগালের বাইরে। আমি উঠে এসে বসি খাবার চেয়ারে। গুনে গুনে দেখি সাত প্রকার রান্না। একটু একটু করে স্বাদ পরীক্ষা করি। বলি রান্নায় ডিপ্লোমা কার?

ওর। মহিউদ্দিনের দিকে তাকিয়ে বলে।

কথা বলতে বলতে খাওয়া শেষ হলে ঋতু ট্রে হাতে কফি নিয়ে আসে। চারপাশে তাকিয়ে আবারও মনে হয় এ ঘরে কতকাল রঙ পালিশ হয়নি। বর্ণহীনতা এমন পরিবেশে খাপ খায় না। ঋতু আমার সাম্প্রতিক বই নিয়ে কথা বলে-আপনি না সুমনার দুঃখটাকে নিয়ে একটু ঠাট্টা করেছেন।

কেন এমন তোমার মনে হলো?

মেয়েটির স্বামী চলে গেছে। দীর্ঘদিন হলো ও অপেক্ষা করছে ফিরে আসার। কিন্তু ওর অপেক্ষার কষ্ট আমাদের ছুঁতে পারছে না। আমাদের ঠিকমতো বেদনার্ত করতে পারছে না।

মেয়েটির নির্ঘুম সময়। আর পার্কের খালি একা বেঞ্চ, অত বড় বেঞ্চটি খালি, কোণে ও একা। মেয়েটির...। আমি থেমে যাই। বলি-স্যরি। দেখি তোমার কথামতো একটু কিছু যদি করতে পারি। যদি সত্যি সত্যি তোমাকে বেদনার্ত...।

আমাকে বেদনার্ত? ঋতু হাসে। আমার চোখের দিকে তাকিয়ে। তারপর গভীর করে বলে-ভালোগুলোর কথা কিন্তু বলিনি।

তারপর আমরা দুজনই হাসি। কথা বলতে বলতে তিনটে পিল খায় ও ফুলকাটা কাচের গ্লাসের মিনারেল ওয়াটারের সঙ্গে। মহিউদ্দিন এসে বসে। বলে লন্ডনের দোকানে আপনার কোনো বই এলেই ওকে পাঠায়। এমনই নির্দেশ।

এখানে তো বেশ দাম হয় বইগুলোর। আর পার্সেল-টার্সেল মিলিয়ে অনেকগুলো পাউন্ডের ব্যাপার।

ওই তো একটি শখ ওর। বলে মহিউদ্দিন। দুজনে বসে আছে পাশাপাশি। বাবুয়া ওপরে ঘুমোতে গেছে। ঘড়িতে রাত প্রায় নটা। বলে ও-কী যে ভালো লাগল এত বছর পর আমাকে দেখে।

দেশে যাও না কেন?

বাবুয়ার জন্য। দেশে গেলে ওকে হয়তো...।

এরপর আমরা চুপ করে থাকি। ঋতু অনেক আগে মেডিকেল জার্নালটি সরিয়ে রেখেছে। অন্য একটি ম্যাগাজিনে চোখ রাখি।

কী এক জাম্পারের প্যাটার্নের নিচে লাল কালির দাগ। তারপর চোখ তুলি। দেখি ঋতু আমাকে দেখছে। বলে-বেশ না প্যাটার্নটি? আমি বাবুয়ার জন্য সোয়েটার করছি ওই প্যাটার্নে।

মহিউদ্দিন কলবেল শুনে দরজা খোলে। নাসির এসে গেছে। রাত নটাতেও চারপাশে আলো। আমরা বাইরে আসি। বলি-বেশ জায়গা।

আপনি এখানে আসবেন কথা দিয়েছেন। এখানে এসে একটি বই লিখবেন।

কথা দেইনি। তবে আসতে চেষ্টা করব। কোনো এক সময়।

জানি আসবেন না।

অপেক্ষায় থেকো।

ঋতু হাসে।

মহিউদ্দিন, নাসির সামনে এগিয়ে গিয়ে কী সব নিয়ে আলোচনা করছে। বোধকরি পোরট্রির এই জায়গা বেশ একটু আলাদা পুরো পোরট্রি থেকে এমনিই কিছু, আমি আর ঋতু পেছনে। সন্ধ্যার আলো আঁধারিতে ঋতু একটু ফিসফিস করে বলে-কাউন্সিল ছাদ ঠিক করে দেবে। আর আমিও হয়তো আবার মেঘবতী হতে পারব। কিন্তু বাঁ চোখটার সমস্যা ঠিক হবে কি না বুঝতে পারছি না। এখানেও অপারেশনে ভুল করে। আমার হাতে চাপ দিয়ে বলে-ওরা বলেছে সর্ট আউট করতে পারবে বাঁ চোখের সমস্যা। না হলে এক চোখ নিয়ে কতজন...। বলেই হেসে ওঠে। যেমন করে ও হাসে কথায় কথায়। আপনি বারবার আমার চোখের দিকে তাকিয়ে কী যেন বলতে চাইছিলেন না? আমি একটু লজ্জিত, মাথা নামাই। ঋতু আবার বলে-আজকাল ও আপনার বই পড়ে বেশি। আর আমি শুনি। বেশ সময় কাটে।

মহিউদ্দিন কি আর স্কুলে...

ও আর কোনো দিন শিক্ষকতা করতে পারবে না।

ঋতু একটু ছোট নিঃশ্বাস নিয়ে বলে। এই বা খারাপ কী? পেছনের বাগান আর পাহাড়ের ওপরে বাড়ি। আর আমরা তিনজন। খানিক দূরেই সবচেয়ে ভালো হার্টের হাসপাতাল।

আমি বলি-বইয়ের দোকানগুলোতে বলে যাব ওরা যেন আমার বই এলেই তোমাকে এক কপি পাঠায়। উজ্জ্বল হয়ে হাসে ঋতু-এত ভালো দিন আজ। এত আনন্দের দিন। এত ভালো লাগছে। বলতে বলতে ঋতুর চোখ চিকচিক করে, ভালো ও ঘোলাটে, দুটোই।